রোযা বা সাওম

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সম্পাদনা : নুমান বিন আবুল বাশার

আলী হাসান তৈয়ব

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ فريضة الصيام ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد شمس الحق صديق

مراجعة: نعمان بن أبو البشر

علي حسن طيب

2012 - 1433

IslamHouse.com

রোযা বা সাওম

রোযার তাৎপর্য

রোযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজের বৈধ ইচ্ছা-চাহিদাগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে পরকালমুখী নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের দীক্ষা নিয়ে একজন ব্যক্তি যাতে তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হতে পারে সে উদ্দেশেই ফরয করা হয়েছে মাহে রমযানে সিয়াম পালনের বিধান। বাঁচার প্রয়োজনে খাবার ও পানীয় গ্রহণ, জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ যৌনবৃত্তি মনুষ্য জাতির একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু মাহে রমযানের দিনের বেলায় একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য একজন মু'মিন এসব থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আর এভাবেই পুরো একটি মাস জুড়ে সিয়াম সাধনার পর আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছার নিরেখে জীবনযাপনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আল-কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে তাকওয়া। **ইরশাদ হয়েছে,**

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

'ঈমানদারগণ!, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের ওপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার'। {বাকারা : ১৮৩}

তবে, কেবল খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং বৈধ যৌনবৃত্তি থেকে বিরত থাকলেই রোযার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। এর জন্য

বরং প্রয়োজন সকল প্রকার মিথ্যাচারিতা থেকে বিরত থাকা। হাদীসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়ল না, তার খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।’

সারাদিন রোযা রাখার পর সন্ধ্যা বেলায় সূর্যাস্তের পর ইফতার গ্রহণ, একজন মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আওতায় নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের পর পরকালে যে বাধামুক্ত জীবন পাবে তারই একটি ছোট্ট উদাহরণ। রোযার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়ার প্রতিদান জান্নাতী জীবন, যেখানে কল্পানাতীতভাবে প্রয়োগ হবে মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা-বাসনা। তবে রোযার এ তাৎপর্য পেতে হলে সকল পাপাকর্ম থেকে গুটিয়ে নিতে হবে নিজেকে অসম্ভবভাবে। বুকে ধারণ করতে হবে ঈমানপূর্ণ পরিতৃপ্ত হৃদয়। যে হৃদয় ঈমানী ভাব-চেতনা সদাজাগ্রত রাখার শুভ পরিণতিতে শোনার সুযোগ পাবে মহান আল্লাহর আহ্বান,

﴿ يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٢٨ فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ٢٩ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ٣٠ ﴾ [الفجر: ٢٧، ٣٠]

‘হে মুতমায়িন (পরিতৃপ্ত) হৃদয়! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের পানে, রাজি-খুশি হয়ে। প্রবেশ করো আমার বান্দাদের ভেতর, প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।’ {সূরা আল-ফাজর : ২৮-৩০}

মাহে রমযানের গুরুত্ব

* এ মাসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য বান্দাকে মুক্তি দিয়ে থাকেন জাহান্নাম থেকে।

* এ মাসে খুলে দেয়া হয় জান্নাতের সবকটি দরজা এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের প্রবেশপথসমূহ।

* এ মাসে আছে ক্বদরের রাত- যা হাজার মাস থেকেও উত্তম।

* এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন।

রোযার ফযীলত

* হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোযা পালন করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।’’ (বুখারী ও মুসলিম)

* রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। হাদীসে এসেছে, ‘রোযা এবং কুরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি একে পানাহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো।’ (আহমাদ)

* রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ওই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।’’

* “রোযা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।” (আহমাদ)

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

১। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযার সময়ে খাবার বা পানীয় গ্রহণ।

৩। রোযা অবস্থায় যৌন-মিলন ঘটলে রোযা শুধু ভঙ্গই হয় না বরং ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টাই ওয়াজিব হয়ে যায়।

৩। চুম্বন, স্পর্শ, হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালেও রোযা ভেঙ্গে যায়।

৪। পানাহারের বিকল্প হিসেবে রক্তগ্রহণ, স্যালাইনগ্রহণ, এমন ইঞ্জেকশন নেয়া যা আহারের কাজ করে, যথা- গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন ইত্যাদিতে রোযা ভেঙ্গে যায়।

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করল তার রোযা ভেঙ্গে গেল’। (মুসলিম)

৬। মহিলাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ) হলে রোযা ভেঙ্গে যায়।

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না

* ভুলবশত পানাহারে রোযা ভাঙ্গে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

* অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যার অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়েছে তার রোযা ক্বাযা করার প্রয়োজন নেই।’ (মুসলিম)

* রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

* রোগের কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্যপাত হলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

* স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন-আলিঙ্গনে রোযা ভঙ্গ হয় না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন। (বুখারী, মুসলিম) তবে যে ব্যক্তি চুম্বন- আলিঙ্গনের পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না বলে আশংকা রয়েছে, তার জন্য এরূপ করা ঠিক নয়।

রোযাদারের করণীয়

* সেহরী খাওয়া। কারণ সেহরী খাওয়া রাসূলের সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা সেহরী খাও, কারণ সেহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।’

* যথাসম্ভব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, বিলম্ব না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা যথাশীঘ্র ইফতার করবে।’ (বুখারী)

* কল্যাণকর কাজ বেশি বেশি করা।

* দান-খয়রাত বেশি বেশি করা।

* বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকর করা।

* কম খাওয়া ও কম ঘুমানো।

* গরীব-দুঃখী, অসহায় মানুষের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

* ধৈর্য্যের অনুশীলন করা।

* দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত হতে চেষ্টা করা।

* জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।

* দুআ-মুনাজাত অধিক পরিমাণে করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা।

* যথাসাধ্য রোযাদারদের ইফতার করানো।

* শক্তি-সামর্থ্য থাকলে রমযান মাসে উমরা পালন করা।

* রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করা।

রমযানের শেষ দশ দিন

রমযানের শেষ দশ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দশ দিনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বস্তুজগতের মায়া-মোহের বাঁধন ছিঁড়ে তাকওয়ামুখী হৃদয় অর্জন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মুখ্য সময় হল মাহে রমযান। আর রমযানের শেষ দশ দিন তাকওয়া ও আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের শেষ সুযোগ। সে হিসেবে বর্ণনাতীত শ্রম দিতে হয় এই দিনগুলোতে। **হাদীসে এসেছে উম্মুল মু'**মিনীন আয়েশা রা.

বলেন, ‘রমযান মাসের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি ইবাদত করেছেন যা অন্য সময় করেননি।’ (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে কোরআন তিলাওয়াত, নামায, যিকর ও দুআর মাধ্যমে রাতযাপন করতেন। তারপর সেহরী খেতেন’।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরেকটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। খুব পরিশ্রম করতেন। এমনকি লুঙ্গি বেঁধে নিতেন।’ (বুখারী ও মুসলিম)

রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তেকাফ করতেন এবং এ ই’তেকাফের জন্য মসজিদের নির্জন স্থান বেছে নিয়ে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও, অন্যসব কাজকর্ম পেছনে ফেলে একনিষ্ঠ হয়ে রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে কাটাতেন।

ই‘তেকাফ

একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের উদ্দেশে সুনির্ধারিত পন্থায় মসজিদে অবস্থান করাকে ই‘তেকাফ বলে।

ই‘তেকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত ই‘তেকাফ

করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর সাহাবীগণ এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। সে হিসেবে রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা সুন্নাত।

ই'তেকাফের উপকারিতা

* ই'তেকাফের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।
* অহেতুক কথা, কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সংযত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে।
* ই'তেকাফ অবস্থায় লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করা সহজ হয়।
* ই'তেকাফের মাধ্যমে মসজিদের সাথে সম্পর্ক তাজা হয় এবং মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে ওঠে।
* ই'তেকাফকারী দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে দূরে অবস্থান করে ইবদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়।
* বদ অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ই'তেকাফের মাধ্যমে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

ই'তেকাফে প্রবেশ

রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফকারীর জন্য, বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তেকাফস্থলে প্রবেশ করা উত্তম। কেননা ই'তেকাফের মূল লক্ষ্য লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান, যা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর একুশতম রাত এরই অন্তর্ভুক্ত। তবে ফজরের নামাযান্তেও

ইতিকাফে প্রবেশ করা যেতে পারে। এ মর্মে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ই'তেকাফ থেকে বের হওয়া

ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর ইতিকাফ থেকে বেরিয়ে পড়া বৈধ। তবে সালাফে সালেহীনের কারও কারও মতে ঈদের রাত মসজিদে অবস্থান করে মসজিদ থেকেই ঈদের জামাতে অংশ গ্রহণ করা উত্তম।

ই'তেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গ

* বিনা ওযরে ই'তেকাফকারী যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার ই'তেকাফ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি শরীরের অংশ বিশেষ বের করে দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ই'তেকাফ অবস্থায় নিজ মাথা বের করে দিতেন। মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কক্ষে বসেই রাসূলুল্লাহর মাথা ধুয়ে সিঁথি করে দিতেন।

অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন, অযু, গোসল, পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি কাজের জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে বের হওয়া জায়েয। আর যদি উল্লিখিত বিষয়সমূহ মসজিদের ভিতরে থেকেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় তাহলে মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ হবে না।

ই‘তেকাফ যদি এমন মসজিদে হয়, যেখানে জুমার নামায হয় না, তাহলে জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদে গমন করা ওয়াজিব।
* ওয়াজিব নয় এমন ইবাদত যেমন জানাযায় অংশগ্রহণ, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয নেই।

ই‘তেকাফকারীর ইবাদত

সব ধরনের ইবাদতই ই‘তেকাফকারীর জন্য অনুমোদিত। যেমনঃ নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, দুআ, ইসতেগফার, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ফতোওয়া প্রদান, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি।

ই‘তেকাফকারীর জন্য পর্দা টাঙ্গিয়ে লোকজন থেকে নিজকে আড়াল করে নেয়া মুস্তাহাব। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তেকাফ করেছেন একটি তুর্কি তাঁবুতে যার প্রবেশ দ্বারে ছিল একটি পাটি। (সহীহ মুসলিম)

ই‘তেকাফকারী প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র, কাপড় ইত্যাদি সাথে নিয়ে নিবে, যাতে মসজিদ থেকে বেশি বের হতে না হয়।

ই‘তেকাফকারীর জন্য মসজিদের ভেতরে পানাহার, ঘুমানো, গোসল, সাজগোজ, সুগন্ধী ব্যবহার, পরিবার-পরিজনের সাথে কথপোকথন ইত্যাদি সবই বৈধ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সীমাতিরিক্ত না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ই‘তেকাফস্থলে তাঁর পত্নীগণের সাক্ষাত ও কথপোকথন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ই‘তেকাফকারী যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন

* অতিরিক্ত কথা ও ঘুম, অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করা, মানুষের সাথে বেশি বেশি মেলা-মেশা ইত্যাদি ই‘তেকাফের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। তাই এ সব থেকে ইতিকাফকারী বিরত থাকবে।

* ইতিকাফ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

কামভাবসহ স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন ই’তিকাফে থাকাকালীন কোনো অবস্থাতেই অনুমোদিত নয়, তা বরং সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

* বায়ূ নিঃসরণ মসজিদের আদবের পরিপন্থী। তাই পারতপক্ষে একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

লাইলাতুল ক্বদর

সম্মানিত রজনী লায়লাতুল ক্বদর। পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল ক্বদরকে বরকতময় রজনী বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আকাশের বায়তুল মা’মুরে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হয় এ সম্মানিত রাতে। এ রাত হাজার মাস থেকেও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতা এবং জিব্রাইল আমীন অবতীর্ণ হন। শান্তির আবহ ঘিরে রাখে প্রতিটি বিষয়কে লায়লাতুল ক্বদরে। এই রজনীতে স্থিরীকৃত হয় প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়। মাগফিরাতের রজনী লায়লাতুল ক্বদর। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছোয়াবের আশায় লায়লাতুল ক্বদর ইবাদতের মাধ্যমে যাপন করে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

লায়লাতুল ক্বদরে শয়তান বের হয় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ রজনীতে শয়তানের বের হওয়ার অনুমতি নেই।

লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করা

রমযানের শেষ দশ দিনে 'লাইলাতুল ক্বদর' তালাশ করা মুস্তাহাব তবে তা বেজোড় রজনীতে হওয়া প্রায় নিশ্চিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা 'লাইলাতুল ক্বদর' তালাশ করো রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রজনীগুলোতে।' তিনি আরো বলেন, ''তোমরা রমযানের শেষ দশকে 'লাইলাতুল ক্বদর' তালাশ করো।'' সে হিসেবে রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে 'লাইলাতুল ক্বদর' হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার উত্তম পদ্ধতি হল রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফে কাটানো এবং শেষ দশকের প্রতিটি রাত ইবাদতের মাধ্যমে যাপন করা। লাইলাতুল ক্বদরে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত দুআ -আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন কারীমুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী- [হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সাদাকাতুল ফিতর

আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারকে অহেতুক-অশালীন কথা ও কাজ থেকে

পবিত্র করা এবং অসহায় মানুষের আহার যোগান দেয়ার উদ্দেশে যাকাতুল ফিতর এর বিধান প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করবে তা ফিতরা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা হবে সাধারণ সদকা।' (আবূ দাঊদ)

যাদের ওপর ফিতরা ওয়াজিব

ঈদের দিন ও রাতে খরচের অতিরিক্ত ফিতরা দেয়ার মত সম্পদ যার থাকবে তার ওপর ফেতরা ওয়াজিব হবে। নিজের ও যাদের খোরপোশের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত, সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'সা- দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম- খেজুর বা এক সা' যব যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। মুসলমান গোলাম-আযাদ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সবার ওপর ফরয করেছেন এবং ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে এটা আদায় করার আদেশ প্রদান করেছেন। (মুসলিম)

ফিতরা নির্ধারণ

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'সা পরিমাণ খেজুর বা এক 'সা পরিমাণ যব রমযানের যাকাতুল ফিতর রূপে ফরয করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আমাদের খাবার দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম। তখনকার সময়ে আমাদের খাবার ছিল যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর। (বুখারী)

বাংলাদেশের প্রচলিত খাবার চাল। সে হিসেবে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম চাল দিয়ে ফেতরা আদায় করা যেতে পারে। যব-কিশমিশ-পনির-খেজুরও একেবারে অব্যবহৃত নয়। সে হিসেবে ধনী লোকদের উচিত এগুলোর মাধ্যমেও ফেতরা আদায়ের চেষ্টা করা।

ফিতরা আদায়ের উত্তম সময়

ফিতরা আদায় করার উত্তম সময় ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে বের হবার পুর্বেই ফিতরা আদায় করার আদেশ প্রদান করেছেন।’ এ কারণেই ঈদুল ফিতরের নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে আদায় করা জায়েয। যেমনটি করেছেন ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ফিতরা আদায়ের স্থান

ফিতরা নিজ এলাকার অসহায় লোকদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। নিজ এলাকায় দরিদ্র লোক না থাকলে অন্য এলাকায় আদায় করা যেতে পারে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিও প্রয়োজন অনুসারে ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে। একজন দরিদ্রকে একাধিক লোকের ফিতরা দেয়া যেতে পারে। আবার একাধিক দরিদ্র

লোকের মাঝেও একভাগ ফিতরা বণ্টন করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তি অন্য লোকের কাছ থেকে ফিতরা গ্রহণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা দিয়ে নিজের ফিতরা আদায় করতে পারবে।

সমাপ্ত